দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
098
11 DEC 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

আমাদের অশান্ত শিক্ষাঙ্গন

মফিজ উদ্দিন আহমদ

আমাদের অশান্ত শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কে দেশবাসীর চিন্তার শেষ নাই। কিন্তু সেই পর্যন্তই। পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটছে না বরং দিনের পর দিন অবনতিই ঘটছে। এখনো পরীক্ষার টুকাটুকি, পরীক্ষার হলে হট্টগোল, ইটপাটকেল ছুড়াছুড়ি, মারপিট, বহিষ্কার, খুনোখুনি, পরীক্ষা বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনকে প্রথমবারের মতো অশান্ত করে তোলে।

১৯৭২ সালের অটো প্রমোশন, পরবর্তী পরীক্ষাসমূহে গণটুকাটুকির উদ্গমন ঘটায়। এই গণটুকাটুকি অধিকতর ব্যাপক ও সুবিধেজনক করে তুলার লক্ষ্যেই পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে যুদ্ধাস্ত্র। অতীতকালে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এই প্রথম তা শত্রুতায় পরিণত হয়।

ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের রীতি আছে বাংলাদেশে। শিক্ষাঙ্গনের এই যখন পরিস্থিতি, তখন এক শ্রেণীর রাজনীতিক এই অবস্থাকে রাজনৈতিক রূপদানে সচেষ্ট হয়। ফলে শিক্ষাঙ্গনের অশান্ত অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। শিক্ষাঙ্গন প্রকৃতপক্ষে পরিণত হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনের ধারা অনুসারেই কোন্দল, মারপিট, বোমা-বারুদ, খুনোখুনি আর গুপ্ত হত্যার রক্তে অপবিত্র হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। পুঁতিগন্ধে এখনো দেশবাসীর অস্বস্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এখনো ঝুলছে তালা।

শিক্ষাঙ্গন এখন রাজনীতির দখলে থাকলেও তা আর শুধু রাজনীতিতেই আবদ্ধ নেই। সেখানে অনুপ্রবেশ করেছে জাতীয় শিক্ষা বিরোধী এক গভীর ষড়যন্ত্র। শুধু শিক্ষাঙ্গনে সার্বিক অশান্তিই নয় সর্বৈবভাবে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই যাতে ভণ্ডুল হয়। গোটা জাতি যাতে শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে অশিক্ষিত বর্বর জাতিতে পরিণত হয়—তারই এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার জন্যই দেশের সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশুনায় নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। পরীক্ষা বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদের মনে। পড়াশুনা না করে পরীক্ষায় নকল ও গণটুকাটুকি করার উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষা ছেড়ে দেশের তরুণ সমাজ যাতে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে। এক ধরনের কোন কোন রাজনৈতিক দল ও কিছু কিছু শিল্প সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে এই জাতি বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করে চলেছে। কখনো তন্ত্র-মন্ত্র, কখনো রাজনৈতিক অধিকার এমনকি কখনো কখনো ধর্মের নামেও। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার কোন চেষ্টা যে কোন মহল থেকেই করা হচ্ছে না তা নয়। দেশের সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-ছাত্র, অভিভাবক প্রকৃতপক্ষে সকল মহল থেকেই চেষ্টা চলছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বিরোধী ষড়যন্ত্রের শক্তি ও গতি এতই প্রবল যে, কোনক্রমেই তাকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। শিক্ষা বিরোধী এক রাক্ষুসে মানসিকতা যেন দেশের তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা দেশের কল্যাণকামী মহলের অযোগ্যতা বা আন্তরিকতার অভাবের কথা বলব না—তবে এই অশান্ত শিক্ষাঙ্গনকে প্রশান্ত করার যে কার্যক্রম এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে—তাতে মূলতঃ কোন ত্রুটি থাকার আশংকার কথাটা আমরা ভুলতে পারি না।

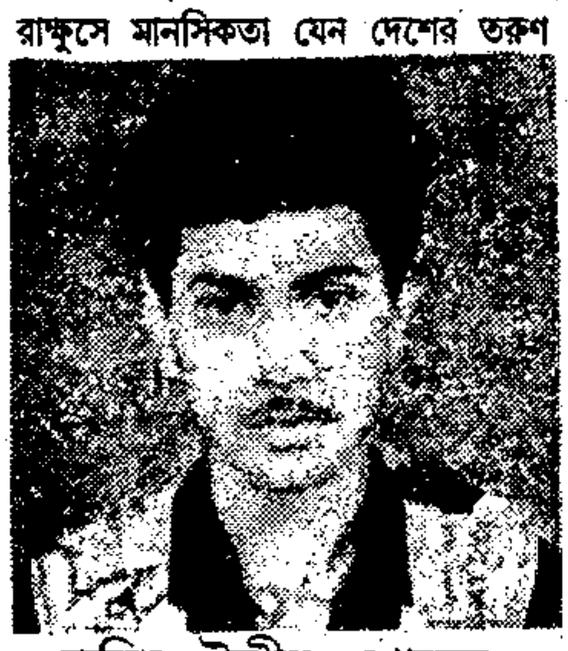

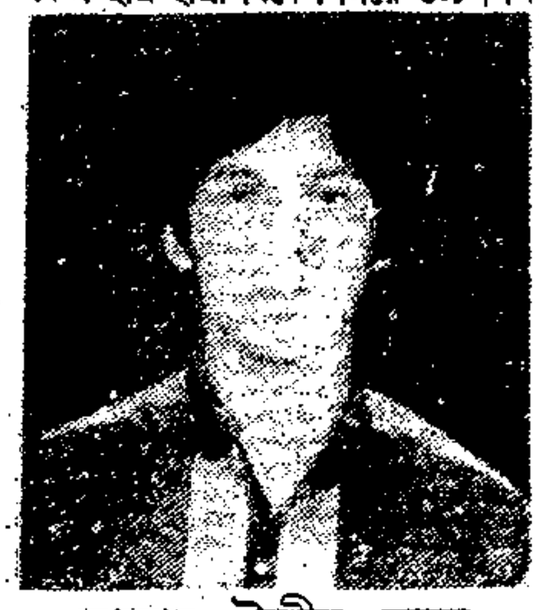

ফরিদ উদ্দীন শোয়েব

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এমন অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে বলেই দেশের শতকরা একশ' ভাগ লোকতো বিদ্যাচর্চা বন্ধ করে দিতে পারে না। যদিও তারা জানে যে, দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে কচি-কাঁচা, তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিরাপদ নয়, ক্লাস, পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে কি হবে না, হলেও কখন, কবে হবে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। এ-ও নিশ্চিত নয় যে, শিক্ষার একটা বিশেষ পর্যায় উত্তীর্ণ হতে ছাত্র-ছাত্রীদের কার বয়স কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষার বয়স ছেড়ে অবশেষে চাকরির বয়সও পেরিয়ে যাবে কি-না? কিন্তু এ অবস্থাতেও যারা শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে চর্চায় আগ্রহী তারা তো বসে থাকতে পারে না। সুতরাং দেশে না হোক বিদেশে, বিভূঁইয়ে হলেও তারা তাদের আপন আপন সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করবেই করবে।

সে কারণে যারা আকেলমান্দ তারা বৈরী পরিস্থিতির ইশারা পাওয়া মাত্র তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অর্থ সামর্থের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। বাংলাদেশ সাধারণভাবেই গরীব দেশ। স্বদেশে সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যয় বহন করাই অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সন্তানদের শিক্ষাদান করা দেশের বেশীর ভাগ অভিভাবকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবুও যারা মোটামুটি অর্থবান তারা নিজেরা কিছুটা কষ্ট স্বীকার করে হলেও সন্তানদের বিদেশে সুশিক্ষা এবং যথাসময়ে শিক্ষা সমাপন করে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়ে থাকে।

তাই বলে, নিজে অর্থ ব্যয় করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাবার একমাত্র পথ নয়। এছাড়াও অন্ততঃ আরো দু'টি পথ খোলা থাকে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে। এর প্রথমটি স্বদেশে পরীক্ষায় অসাধারণ ফল অর্জন করে স্কলারশীপ লাভের মাধ্যমে দ্বিতীয়টি বিদেশে পার্টটাইম চাকরি সংগ্রহের মাধ্যমে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিদেশ গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী তারা স্বভাবতই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে এবং পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে অপরের তুলনায় ভাল ফল অর্জন করে বিদেশ যাবার সুযোগ পায়। এটি সর্বাত্মকভাবে ছাত্র-ছাত্রীর নিজের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় স্থানটি বিশেষতঃ নির্ভর করে যোগাযোগ এবং প্রচেষ্টার উপর। উভয় পথেই বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জীবনে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং এখনো পড়াশুনা করছে এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রীর নাম আমাদের জানা আছে। এখনো প্রায় পরায়ই অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশ যাচ্ছে। স্বদেশে বসবাস করে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে বিদেশ গিয়ে সম্মানিত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করায় দোষ কি?

সালাহ উদ্দীন সুমন

স্কলারশীপ পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়া খুবই সহজ। স্বউদ্যোগে যাওয়া বেশ কিছুটা কঠিন। কিন্তু একবার যেতে পারলে সফলতা লাভ করা প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব। এ, কে, এম, শাহাব উদ্দীন মিলকি ও সৈয়দ সুলতানা দম্পতির দুই ছেলে ফরিদ উদ্দীন শোয়েব এবং সালাহ উদ্দীন সুমন। অসাধারণ মেধা তাদের। পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে সফলতা লাভ করে দুই ভাই-ই বিদেশ গেল স্কলারশীপ নিয়ে। ১৯৮৬ সালে ফরিদ উদ্দীন শোয়েব গেল পাকিস্তানে। মেডিক্যাল পড়ছে এখন করাচীতে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে করাচী মেডিক্যাল কলেজে। পরের বছর সালাহ উদ্দীন সুমন একইভাবে স্কলারশীপ নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গেল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মেশিন টুল্স পড়ছে সে। ওর কলেজ ভল্গোগ্রাদে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে সে-ও এর মধ্যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভালোবাসা অর্জন করেছে। বিদেশে অধ্যয়নরত এ দেশের ছেলে-মেয়েরা সেখানে শুধু ছাত্র-ছাত্রীই নয়—সফল এ্যামিবেসেডরও। বিদেশে তারা লেখাপড়া করে সত্য সেই সঙ্গে তারা সে দেশের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ। জানতে পারে তাদের দেশজ শিল্প সংস্কৃতি এবং লোকাচারকেও। এভাবেই দুই দেশের মধ্যে সখ্যতা বাড়ে। শোয়েব জানিয়েছে, পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের তার খুব ভাল লাগে। এ্যানাটমি বিভাগের প্রধান প্রফেসর কাসাফুদ্দোজার স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছে সে। তাদের উন্নত মনমানসিকতা তাকে মুগ্ধ করেছে। তার সম্ভাব্য এমবিবিএস ডিগ্রী পাওয়ার বছর ১৯৯০।

সালাহ উদ্দীন সমুন বলেছে—রুশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। পরীক্ষায় কুইজটাই প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষকদের সাজেশন কিংবা নোট দেবার কোন বালাই নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪০ মিলিমিটারের বাইরে যাওয়া অনুমোদিত নয়। রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষকদের কোন সম্পর্ক নাই। কলেজে তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনৈক শিক্ষিকা নাম লুদমিলা মিখাইলভন উস্তিনভ—বয়স ৪২ বছর।

যা হোক, আমাদের অশান্ত ও বারুদের গন্ধে ভরা শিক্ষাঙ্গনে বসে উন্নত দেশের শিক্ষা ক্যাম্পাসের কথা বলা বা শুনা দুই বেমানান। মনে হয় ওদের তুলনায় আমরা যেন কোন ভিন গ্রহের মানুষ। তবুও কথাটা এ জন্যই বললাম যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সকল বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে তারা দেশে ফিরে গিয়ে তাদের পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমাদের সম্পর্কে কি বলে মন্তব্য করতে পারে—একবার অনুমান করা প্রয়োজন।

উপসংহারে একটি কথা পুনরুল্লেখ করছি। আমরা আগেই বলেছি—আমাদের অশান্ত শিক্ষাঙ্গনকে শান্ত ও সুস্থ করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের কোথাও হয়তো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। যে কারণে আমাদের কোন প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কাটছে না! নিজেদের জীবনকে নিরাপদ বোধ করছে না ছাত্র-ছাত্রীরা, উদ্বেগ উপশম হচ্ছে না অভিভাবকদের। আপনাদের সকলের কাছে আমাদের সানুনয় আবেদন—ছোটবড় সকলেই ভেবে দেখুন, আমাদের গৃহীত ব্যবস্থার কোন্ জায়গাটায় কি সংশোধন করলে অশান্ত শিক্ষাঙ্গন আবার শান্ত হতে পারে। আমাদের তরুণ সমাজ বেরিয়ে আসতে পারে সর্বনাশী ষড়যন্ত্র জাল থেকে। একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে লাশের মতো সমাধানহীন সমস্যা সামনে নিয়ে কোন জাতিই স্বস্তিতে বেঁচে থাকতে পারে না।